মেরুন রঙের সোয়েটার
প্রবুদ্ধ বাগচী

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই রিনি বলল, তোমার ফোন এসেছিল। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ে-মুখে জল ছেটাতে ছেটাতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেরছিল, নাম বলেছে?
— না। শুধু বলল বিজয়চাঁদ কলেজ থেকে বলছি। অবশ্য পরে করবে বলেছে। তুমি কি চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে এখন? বিজয়চাঁদ কলেজ ..... তার মানে নিশ্চয়ই গোবিন্দ ঘোষ! আমি মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম। অবশ্য অন্য কেউও যে হতেপারে না তা নয়। রিনির পরের কথাটা আমি খেয়াল করিনি। গোবিন্দ ঘোষ মানেই কলেজের এটা-ওটা সমস্যা নিয়ে বকে বকে মাথা খারাপ করে দেবে ..... পরে আবার কখন করবে কে জানে! রিনি বলল, কী হল, বলো চায়ের সঙ্গে কিছু দেব, না শুধু চা! ওর কথায় আমার সম্বিত ফিরল। শুধু চা-ই খাব, আমি বললাম।
প্রতিদিনের মতো চা তৈরী হওয়ার আগে পর্যন্ত আজকের খবরের কাগজটা নিয়ে সোফায় আরাম করে বসলাম। ভেতরের ঘরে আমার আট বছরের ছেলে প্রতীক ওরফে গুবলু এখন স্কুলের হোমটাস্ক করছে। রোজই এই সময়টায় তাই করে। সাড়ে আটটা নাগাদ ওর পড়াশোনার পর্ব মিটবে। তারপর আমার সঙ্গে কিছু(ণ গল্প করবে — স্কুলের গল্প। জানোতো বাবা, আজকে না মিস সুগতকেখুব বকেছে কারণ ও হোমটাস্ক করে আনেনি, অথবা, জানোতো, অনির্বাণ আমাকে বলেছে ওর বাবা নাকি অফিসের কাজে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল, ওখানে নাকি বাতাবিলেবুর মতো পেঁয়াজ পাওয়া যায়। আমার কাজ এগুলো মন দিয়ে শোনা, দু-একটা টুকরো মন্তব্য করা।
রিনি দুজনের জন্য দু কাপ চা নিয়ে এসে আমার পাশে সোফায় বসল। আমি বললাম, শোনো সামনের সপ্তাহের পরের সপ্তাহে চারপাঁচ দিনের জন্য দিল্লী যেতে হচ্ছে, তোমরাও যাবে নাকি?
কী ব্যাপার? রিনির গলায় কৌতূহল।
— দিল্লীর জওহরলাল নেহে(ইউনিভার্সিটিতে একটা লিটারেরি একস্‌চেঞ্জ প্রোগ্রাম হচ্ছে, পশ্চিবাংলার পাঁচটা কলেজ থেকে রিপ্রেজনটেটিভ যাচ্ছেন, আমাদের কলেজের ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি যাব ঠিক হয়েছে?
— প্রিন্সিপ্যাল তোমাকেপাঠাচ্ছেন? তোমার আর সব কলিগদের তো চোখ টাটাবে!
— আসলে এবারের ব্যাপারটা সেরকম নয়। বাকিরা সেভাবে কেউ যেতে রাজী নয়, সবারই একটা না একটা অসুবিধা আছে। তাছাড়া দিন পনের পর দিল্লীতে বেশ ঠান্ডা পড়ে যাবে, এতটা ঠান্ডায় অনেকেই ঠিক .....
— কেন, তোমার কলিগরা কি সব বুড়িয়ে গেল নাকি? শীতে এত ভয় কিসের? রিনি বলে ওঠে।
— না, মানে, আমাদের ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র রনজয়দা আর বন্দনাদি যাবে না। রইলাম আমি আর সুব্রত, সোহিনীতো অনেক জুনিয়র আর বাকি দুজনতো পার্টটাইম, সুতরাং .....
— তার মানে সারভাইবাল অফ দি ফিটেস্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ সারভাইভড্! রিনি হাসে।
হাসির ধাক্কা লাগে চায়ের কাপে। আমিও এই মজাটা গায়ে না মেখে পারিনা। কিন্তু বলো, তোমরা যাচ্ছো কি না?গুবলুর পরী(াটা কবে যেন? টিকিট কাটতে হবে তো!
— আমার খুব একটা ইচ্ছে নেই! এই তো দুবছর আগেই দিল্লী ঘুরে এলাম। গুবলুর পড়া কামাই, আমার অফিসেও আজকাল হুটহাট ছুটি নিলে অসুবিধে হয় ..... তুমিই ঘুরে এসো ..... তাছাড়া ..... রিনি কথা থামাতে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। তাছাড়া কী? না, ... আসলে তোমার কলেজের ওয়ার্কশপ -টপ থাকলে তুমি তো সেই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সেখানেই আটকা — ঘোরাঘুরি বেড়ানোর সময়টা কোথায়?
হ্যাঁ .....দ্যাট্‌স এ পয়েন্ট।
আমি চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলাম। সত্যিই কাজের সূত্রে গেলে এটা একটা সমস্যা। এর আগে একবার শিলংএ নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনির্ভাসিটির প্রোগ্রামে রিনি আর গুবলুকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু দিন পাঁচেকের ট্যুরে সেবার বেড়ানোর সুযোগ মিলেছিল মাত্র একদিন, তাও সেই ইউনির্ভাসিটির বাসে ওদের নিজস্ব কন্ডাকটেড ট্যুর। রিনি সেবার বেশ রাগ করেছিল। আমি তখন কথা দিয়েছিলাম পরে আরেকবার নিছক বেড়াতে শিলং -এ আসব। অবশ্য গত চার বছরের মধ্যে সেটা আর হয়ে ওঠেনি। হতেপারে এই পুরোনো অভিজ্ঞতাটা রিনি এখনো মনে রেখেছে। মনে রাখতেই পারে। এবারেও যে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না কে বলতেপারে! তারপর এবারের প্রোগ্রামে অস্ট্রিয়ার একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক আসবেন বলে শোনা যাচ্ছে, তাতে অনুষ্ঠানটা আরও ইন্টারেস্টিং হবে। যাও, তুমি একাই ঘুরে এসো। রিনি আর কথা বাড়াল না।
হ্যাঁ, সেটাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে, মনে হয়। আমি মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসি। তাহলে কাল পরশুর মধ্যে টিকিট কাটার ব্যবস্থা করতে হবে, আপ-ডাউন দুটো টিকিটিই সময়মতো হাতেপাওয়া চাই।
রিনি চায়ের কাপ নিয়ে উঠেপড়ল। আমি কাগজের ভেতরের পাতায় চোখ বোলাতে থাকি।
রাতের খাওয়া সেরে ওঠার পরেপরেই গোবিন্দ ঘোষের ফোন এল। কলেজ নিয়ে একথা সেকথা হওয়ার পর ও বলল, ওদের কলেজ থেকেও একজন যাচ্ছেন দিল্লীর অনুষ্ঠানটায়। নতুন মেয়ে, বছর দুয়েক ঢুকেছে কলেজে। ইংরেজি আর বাংলা দুটোতেই নাকি লেখালেখি করে, ফলে ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে গোবিন্দ ওকেই পাঠাবে ঠিক করেছে। ওই মেয়েটিকে গোবিন্দ বলে দিয়েছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে, একই সঙ্গে যাতে দিল্লী যেতেপারে।
আমি একবার গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সঙ্গে ভেড়ালি কেন? ওর বাড়ির লোক-টোক .....
গোবিন্দ বলল, আরে দেখবি একদম বাচ্চা মেয়ে! এখনো মিসেস হয়নি। বাড়ির লোক একটু চিন্তা তো করবেই, আমি বলে দিয়েছি আপনাদের কোনো চিন্তা নেই, আমার বন্ধু তো আছে!
আমি মজা করে বললাম, আমাকে বাড়তি দায়িত্ব দিচ্ছিস তাহলে! আরে দায়িত্ব - ফায়িত্ব কিছু নয় .....একসাথে যাবে-আসবে ব্যাস! গোবিন্দ নিজের মনেই হাসে। হাসির শব্দ ভেসে আসে ফোনের মধ্যে।
দিল্লী রওনা হওয়ার আগের দিন সকালে শরীরটা ভীষণ গা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। সকালের নতুন ঠান্ডা লেগে গেছে বোধহয়। এখনো সব গোছগাছ সম্পূর্ণ হয়নি। পাঁচদিনের জন্য বেরোনো হলেও সব জিনিষই গুছিয়ে নিতে হবে। সন্ধ্যেবেলা রিনি অফিস থেকে ফিরে সবকিছু ফাইনাল করে গুছিয়ে দেবে। আজ আমার কলেজের অফডে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। এমন সময় ফোন বাজল।
ফোন তুলতে ওপাশে এক অচেনা নারীকণ্ঠ। রিনরিনে।
আমি স্বাগতা সেন। বিজয়চাঁদ কলেজ থেকে বলছি। প্রফেসর মিত্র আছে আমি প্রথমটায় ঠিক বুঝতেপারিনি। তারপর কলেজের নামটা বলায় অনুমান করলাম ইনিই বোধহয় সেই গোবিন্দর কলেজের নতুন মেয়েটি।
হ্যাঁ বলছি। বলুন। আমি সাড়া দিই এবার।

স্যার, আপনি কাল যাচ্ছেন তো?
হ্যাঁ দিল্লী। আপনি নিশ্চয়ই গোবিন্দর ডিপার্টমেন্টের থেকে যাচ্ছেন। হ্যাঁ স্যার। ঠিকই ধরেছেন। আপনার সঙ্গে তো ওঁর কথা হয়েছে শুনলাম। কালকে আপনার হাওড়া রাজধানী তো?
ঠিক। ঠিক।
স্যার, আপনার কোচ নংটা একটু বলবেন? বুঝতে পারছি না আমাকে পুরো রাস্তাটা একা যেতে হবে কি না!
আমার কোচ নং সম্ভবত এ. এস. সিক্স্, বার্থ বত্রিশ। নিজের কোচ নং আর বার্থ নং দুটো আমার মনে থাকায় জানাতে অসুবিধা হয় না।
আরে, তাহলে তো ভালই হল! আমারও এ. এস.সিক্স্, তার মানে একই কামরা!
ভেরি গুড! তাহলে দুজনে গল্প করে সময় কাটানো যাবে, কি বলেন?
যা বলেছেন, স্যার। ঠিক আছে, কালকে তাহলে দেখা হয়ে যাবে।
হ্যাঁ। ঠিক।। কিন্তু আপনাকে আমি চিনব কি করে?
ওপাশে একটা হাল্কা হাসির শব্দ হয়। গোবিন্দদা আপনার চেহারার ডেসক্রিপশন আমাকে দিয়ে দিয়েছেন, আমিই আপনাকে খুঁজে নেব! সেই ভাল। আমি ফোনটা ছেড়ে দিলাম।
হাওড়া-দিল্লী রাজধানী এক্সপ্রেস নির্ধারিত কামরায় উঠে সবে নিজের ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে বসেছি, রিনরিনে যুবতীকণ্ঠে সামনে এসে দাঁড়াল। স্যার, আমি স্বাগতা। নমস্কার।
মাঝারি হাইট, ফর্সা সুডৌল মুখ, এক কথায় সুশ্রী, পরনে কচিকলাপাতা সালোয়ার কুর্তা, হাতে পাতলা সোনালী ঘড়ি, ডান হাতের মুঠোয় ধরা মোবাইল।
মনে মনে একটা হিসেব তো ছিলই কিন্তু এ যে দেখছি নিতান্তই বাচ্চা মেয়ে। ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেই বোধহয় চাকরিটা পেয়ে গেছে। ওই একটা রো পরে বাঁদিকে জানলার পাশে। স্বাগতা সেন বলল। ট্রেনে সবাই উঠে পড়লে চেঞ্জ করে আপনার এখানটায় চলে আসব, আপনার আপত্তি নেই তো?
না, না। ভালই তো। দুজনে বেশ গল্প করা যাবে। আমি সম্মতি জানাতে দেরি করি না। যদিও আমার আপার বার্থটা জনৈক ডি. পুরকায়স্থ (৫৬) -র নামে বরাদ্দ রয়েছে দেখেছি। তিনি অবশ্য এখনো আসেননি। বয়স্ক মানুষ। যদি এই বদলাবদলিতে রাজি না হন! ভাবনাটা আমার মাথায় ঘুরপাক খায়। তবে মনে মনে ভাবি, স্বাগতা সেন এখানে এসে বসলে ভালই হয়! কেন? আমার তো একাই যাবার কথা ছিল। নাকি একই সাবজেক্ট, একই প্রফেসনের কলিগ, তার জন্য কোনো ফেলো ফিলিং? নাকি নিছকই একটা ভাললাগার ব্যাপার, ওসব কিছু নয়! ভাবনাটার থেই পাই না।
ট্রেন ছাড়ার আগেই অবশ্য সব পাকাপাকি হয়ে গেল, অর্থাৎ জায়গা বদলের ব্যাপারটা। ডি. দাসগুপ্ত চলে গেলেন স্বাগতা সেনের বার্থে আর স্বাগতা সেন আমার সামনে। ভালই হল। আমি মনে মনে বললাম। দুজনের গন্তব্য যখন এক তখন একসঙ্গে থাকাটাই ভাল নয় কি?
ট্রেনের খাবার আসতে এখনও দেরি আছে। হাতব্যাগ থেকে একটা পট্যাটো চিপ্সের প্যাকেট বার করে স্বাগতা সেন আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল, স্যার, নিন, খান।
আচ্ছা আপনি আমাকে স্যার স্যার করছেন কেন? আমি প্রশ্ন করি।
না স্যার, আপনি কত সিনিয়র!
তাতে কি হল? আপনি এক হিসেবে আমারও কলিগ, হলেনই বা জুনিয়র!
না স্যার, গোবিন্দদা বলছিলেন .....
কিচ্ছু বলাবলি নেই, আপনি ওই স্যারটা ছাড়ুন!
ঠিক আছে। তাহলে আপনিও আমাকে আপনি 'আপনি' করবেন না বলুন! স্বাগতার গলায় পাল্টা দাবির সুর।
আমি এবার হেসে ফেলি। পোষ্ট গ্রাজুয়েশন কোন ইয়ার?
টু থাউজ্যান্ড ওয়ান। যাদবপুর।
আই. সি! তাহলে তো তুমি বলা ছাড়া উপায় নেই দেখছি। আমার নাইনটি ওয়ান। ক্যালকাটা। নাইনটি ফাইভ থেকে কলেজ। মাঝে একটা বছর একটা স্কুলে পড়িয়েছি। তোমার বোধহয় বিজয়চাঁদ কলেজ বছর দুয়েক হল, না কি?
হ্যাঁ। দুহাজার তিনের জুলাই মাস থেকে।
পোষ্টগ্র্যাজুয়েশনের পর আর কিছু .....
এই বছর জানুয়ারীতে পি. এইচ. ডি.-র থিসিস জমা দিয়েছি। বাহ, চমৎকার! দেন ইউ উইল বি ডক্ স্বাগতা সেন ভেরি সুন!
স্বাগতা হাল্কা করে হাসে। দাঁড়ান আগে হোক।
পটেটো চিপ্স্ খেতে খেতে কথা এগোতে থাকে। গাড়িটা এখন বেশ স্পিড নিয়ে নিয়েছে। এয়ারকন্ডিশনের আরামটা টের পাওয়া যাচ্ছে আস্তে আস্তে। বাকি যাত্রীরা যে যার জায়গায় গুছিয়ে বসেছে। এতক্ষণে। দু-একজন ইতিমধ্যেই আপার বার্থে গা এলিয়ে দিয়েছে। রাজধানী এক্সপ্রেসে খাবারটা ট্রেনেই পাওয়া যায় বলে ওই টিফিন কেরিয়ার খুলে বসার ব্যাপারটা এখানে নেই। সব মিলিয়ে একটা হাত্ পা ছড়ানো স্বস্তির ভাব। আমি আলাদা করে যেন এই স্বস্তিটা অনুভব করতে পারি। কী জানি, এর সবটাই হয়তো এয়ারকন্ডিশনের আরামের জন্য নয়।
আমার থেকে জুনিয়র এক সহকর্মী, ইংরাজীতে যাকে বলে ফেয়ার কমপ্লেক্সন, উচ্চশিক্ষিতে, চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত — এমন একজনের সঙ্গে একসঙ্গে যাওয়ার গোপন আনন্দ। নাকি, ভাবতে ভাল লাগছে, আগামী পাঁচ-ছ' দিন এই মেয়েটির সঙ্গ পাওয়ার একটা নিশ্চয়তা ঘিরে ভাল লাগার বোধ। দিল্লীতে নানা প্রদেশের মানুষের মধ্যে গিয়ে নিজের রাজ্যের সহকর্মীদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা তো থাকবেই, শুধু কি সেই ঘনিষ্ঠতার উষ্ণতা? নিজেকে নানা প্রশ্ন করতে থাকি মনে মনে। আর তারই সূত্রে বোধহয় আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে বসি, স্বাগতা, ফিরছ কবে?
কেন? সাতাশ তারিখের রাজধানী। আপনি?
আমারাও তাই। আসলে ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত তো আমাদের প্রোগ্রাম, ওই দিনের টিকিট কাটলে একটু রিস্ক হয়ে যেতো ..... কখন শেষ হবে ..... এগজ্যাক্টলি। আমিও তো ওসব ভেবেই ওদিনটা বাদ দিলাম।
তাহলে ফেরার সময়েও একসাথে ফিরছি আমরা!
'আমরা' নিজের অজান্তেই যেন কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। 'আমরা' কথাটার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতার তাপ আছে না।অথচ মুখ ফস্কে যে কথা বেরিয়ে গেছে তাকে আর ফেরাব কেমন করে। মনে মনে একটু কুণ্ঠিত হয়ে গেলাম আমি। অথচা স্বাগতা বলেবসল, খুব ভাল হল হীরকদা। দাঁড়ান, দাঁড়ান। হাতের ব্যাগটার একটা গোপন পকেট থেকে একটা সাদা খাম বার করে আনল ও, এটা ফেরার টিকিট, দেখুনতো কোচ নম্বরটা কত? আমার দিকে খামটা এগিয়ে দিল স্বাগতা। দিয়ে বললাম এ. এস. টেন, তার মানে তোমার - আমার একই কোচ।
ওফ্ কী মজা! স্বাগতা উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠল। আমি বললাম, আসলে কি জানো, টিকিট কাটার পর থেকেই আসা আর যাওয়ার কোচ নম্বরটা আলাদা করে লিখে রেখেছি বলে ও দুটো মুখস্থ হয়ে গেছে বলতে পারো।

কিন্তু এই মামুলি কথাটা বললেও টের পেলাম, আমার বুকের মধ্যেও যেন একটা ভাললাগার সুগন্ধি স্রোত বয়ে গেল। কিন্তু মুখে তার কোন প্রকাশ ঘটল না বরং সচেতনভাবেই আমি প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইলাম। অথচ আমার সামনে স্বাগতার ছিটকে ওঠা উচ্ছলতা, ওটা যেন হঠাৎ ক্যামেরার ফ্ল্যাসব্যাকের মতো জ্বলে উঠে আমার ভেতরে একটা স্থিরচিত্র হয়ে গেল, মাঝে মাঝে অ্যালবামের পাতা খুলে যাকে দেখে নেওয়া যায়। তবু প্রসঙ্গ পাল্টে আমিই আবার কথা শু(করলাম।

গোবিন্দ বলছিল, তুমি নাকি রীতিমতন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করো — বোথ ইন ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি।

স্বাগতা হাসল। ওই আর কী।

না, না, ওরকমভাবে এড়িয়ে গেলে তো হবে না। জটায়ু হলে হয়তো বলত, আপনাকে তো মশায় কনট্রিভেট করতে হচ্ছে।

এবার স্বাগতা বেশ জোরে হেসে ওঠে, দা(ণ বলেছেন তো।

তা কী নিয়ে লেখা-টেখা একটু শুনি, আমি কৌতূহল বাড়াই।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার লিটারেরি সাপ্লিমেন্টটায় মাঝে মাঝে লিখি। টেলিগ্রাফেও বেশ ক'বার রিভিউ-টিভিউ করেছি। আর বাংলা লেখা বলতে কবিতা — এখানে, ওখানে ..... লিটল ম্যাগাজিন। আচ্ছা, হীরকদা, আপনি কবিতা পড়েন? স্বাগতার পাল্টা কৌতূহল প্রকাশ পায়। একসময় খুব মন দিয়ে পড়তাম। ওই সুনীল-শক্তি(-শঙ্খ-উৎপল .... ইদানিং আর আগ্রহ পাই না তেমন।

কেন? স্বাগতার বেশ উদগ্রীব প্র(।

কারণ ..... কী জানি স্পেসিফিক্ বলতে পারব না ..... তবে কবিতা তেমনভাবে আমাকে আর টানে না ..... লাইফটাই বোধহয় খুব প্রোজেইক হয়ে গেছে।

কী যে বলেন?

তবে তোমার কবিতা পড়ার ইচ্ছে থাকল। সুযোগ পেলেই পড়ব। আমি হঠাৎই বলে ফেলি।

কথাটা কি খুব গায়ে পড়া হয়ে গেল না আমার। যে আমি বলছি কবিতায় আগ্রহ পাইনা, সেই আমি আবার একজনের কবিতার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছি। কথাটার মধ্যে কি একটা যেন .....

আসলে আমার আগ্রহটা সত্যি সত্যি কবিতার প্রতি নাকি কবির দিকে? নিজের কাছে নিজেই প্র(টা ছুঁড়ে দিই আমি। আজকে কেন এমন হচ্ছে আমার।

নিজের লেখা নিয়ে প্রত্যেকেরই একরকম সংকোচ থাকে। স্বাগতাও তাই স্বাভাবিকভাবে বলল, কী আর পড়বেন? সব আজেবাজে লেখা। এই কথার জবাবে আমিও আর কথা বাড়ালাম না।

কথায় কথায় বেশ অনেকটা রাত হয়েছে খেয়ালই করিনি। ট্রেনের কেটারিং স্টাফরা খাবার নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই বুঝলাম স্বাগতার সঙ্গে গল্পে অনেকটাই সময় কেটে গেছে ইতিমধ্যে। দুজনে মুখোমুখি বসে রাতের খাবার খেতে খেতে দু-একটা টুকটাক

মামুলি কথা হল, সবটাই দিল্লীর অনুষ্ঠান ঘিরে। আসলে এ(ত্রে প্রসঙ্গটা বদলে দিল স্বাগতা নিজেই। হীরকদা, অস্ট্রিয়ান রাইটার শেষ পর্যন্ত আসবেন তো? শুনছি তো আসবেন। এরকম প্রোগ্রাম মিস্ করবেন না বলে মনে হয় না। যাই বলুন হীরকদা, আমি বেশ উত্তেজিত। ইট্স এ গ্রেট অপরচুনিটি। সে তো বটেই। জানেন, মাসখানেক আগে আমি এই ভদ্রলোকের একটা ইন্টারভিউ পড়েছি। ইন্টারনেটে। খুব রিভিলিং।

তাই নাকি?

কথার মাঝে স্বাগতার মোবাইলে একটা ফোন এসে গেল। বোধহয় বাড়ির লোক। আমাদের কথার সূত্রটা কেটে গেল। তাছাড়া বাকী সহযাত্রীরা এবার ঘুমের তোড়জোড় করছে। কামরার মধ্যে এখন বেশ ঠান্ডা। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও আমাদের আর কথাবলার সুযোগ নেই। এবার ঘুমের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাগতাকে বললাম, আমি ওপরের বার্থে যাচ্ছি। তুমি শুয়ে পড়ো। স্বাগতা বলল, তবে হীরকদা, আমার ঘুম কিন্তু খুব গাঢ়। মালপত্র সব আপনার দায়িত্বে থাকল। আমি হাসলাম। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারো। আমার ঘুম খুব সতর্ক আর তাছাড়া এই ট্রেনে ওসব ভয় নেই।

বার্থে শুয়ে আর ঘুম আসতে চাইছিল না। একে একটা অনভ্যস্ত জায়গা তার ওপর একটা উত্তেজনার চাপা অনুভব। কেন জানি না স্বাগতাকে আমার ভাল লাগছে। কয়েকঘন্টা আগেও আমার সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না অথচ আলাপ করে কথা বলে বেশ ভাল লাগছে আমার, ওর সান্নিধ্যটাও আমি যেন উপভোগ করছি। এটা কেমন ভাললাগা? এর মধ্যে কি অন্যায় কিছু আছে।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমটা ভাঙল হঠাৎই। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। কামরার আবছা আলোয় হাতঘড়িতে সময়টা দেখার উপায় নেই। এটা কি কোনো স্টেশন? মনে হচ্ছে যেন পু(কাঁচের দেওয়াল পেরিয়ে আবছা কথার শব্দ পাচ্ছি। নিচে নেমে এলাম। গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢেকে স্বাগতা ঘুমিয়ে আছে নিচের বার্থে — আবছা আলোয় ওর ঘুমন্ত মুখটা স্পষ্ট। যে কোনো ঘুমিয়ে পড়া মুখেরই আশ্চর্য একটা সৌন্দর্য আছে।

আমি সাবধানে কামরার বাইরে এলাম। কানপুর স্টেশনে দাঁড়িয়েছে ট্রেনটা। এখন ভোররাত। বিরাট প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ব্যস্ততার শেষ নেই — চা-ওলা, খবরের কাগজ, জলের বোতল। কিছু যাত্রী নেমেছে ট্রেন থেকে, মালপত্র নিয়ে কুলির সঙ্গে দরকষাকষি চলছে তাদের। কিছু যাত্রী নিশ্চয়ই উঠেছে এই ট্রেনে। আর ঘন্টা পাঁচ - ছয় গেলেই দিল্লী।

গাড়ি ছাড়ার সিগনাল দেখে আবার কামরায় উঠে পড়লাম আমি। কলকাতাতেও এখন ঘুমের মধ্যে ডুবে আছে রিনি আর গুবলু। ভোরবেলায় বাথ(মে যাবার জন্য ঘুম ভেঙে উঠে কতদিন ওদের ঘুমন্ত মুখও তো দেখেছি আমি। সন্তর্পনে স্বাগতাকে এড়িয়ে ওপরের বার্থে উঠতে গিয়ে আবার চোখে পড়ল ঘুমিয়ে থাকা একটা সুন্দর মুখ।

২.

অনেককাল আগে একবার জহরলাল নেহে(ইউনির্ভাসিটিতে এসেছিলাম কোনো একটা দরকারি কাজে। সেবারে বি(েবিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটা ঘুরে দেখার সময় পাইনি। এবারে এসে দেখছি, আশ্চর্য সুন্দর এই ক্যাম্পাসটা। বি(েবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ছাড়িয়ে নানান বিভাগের বাড়ি — সেগুলো পেরিয়ে একটা বড় মাঠ। পিচঢালা চওড়া রাস্তার দুদিকে নানারকম গাছ খুব পরিকল্পনা করেই লাগানো। আমাদের থাকার জন্য যে গেস্টহাউসটা সেটা ওই মাঠটা পেরিয়ে। তিনতলা বিরাট গেস্টহাউস, চারদিকে বাগান, সুন্দরকরে ছাঁটা ঘাসের গালিচা আর চমৎকার সব বাহারি ফুল। ঘরগুলোতেও সবরকম সুবিধা ও আধুনিক বন্দোবস্ত রয়েছে। পাঁচদিনের জন্য এসে বেশ রাজকীয় আরামই বলতে হবে।

এখন প্রায় সন্ধে নামছে। আজকে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষে ঘরে ফিরে একটু মুখ-হাত ধুয়ে নিয়ে আমি একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, প্রথমত প্রশাসনিক ভবনের সামনের পাবলিক বুথ থেকে বাড়িতে একটা ফোন করা, দ্বিতীয়ত, একটু ঘুরে ফিরে ক্যাম্পাসটাকে দেখা।

আমার ঘরটা গেস্ট হাউসের পূবদিকের দোতলায়। স্বাগতা রয়েছে আমার বিপরীত দিকে কোনাকুনি দুশো আট নম্বর ঘরটায়। আজকে দুপুরের দিকে কলকাতা থেকে আরও দুজন অধ্যাপক এসে পৌঁছেছেন। দুজনেই বেশ বয়স্ক। একজন সুছন্দা মিত্র, দীনেন্দ্রচন্দ্র কলেজ আর অন্যজন প্রণবেশ পাঠক, বিনোদিনী গার্লস কলেজ। এঁরা দুজনেই আছেন একতলায়। বয়সের কারণে সম্ভবত এঁদের সিঁড়ি ভাঙায় অনীহা। শুনছি নাকি, কলকাতা থেকে আরও একজনের আসার কথা তবে এখনো তিনি এসে পৌঁছাননি।

আজকের ওয়ার্কশপ শেষ করে আমরা চারজন একইসঙ্গে গেস্ট হাউসে ফিরেছি। তবে বাকি দুজন বয়সের তফাতের কারণেই হোক বা পূর্বপরিচয় না থাকার

কারণে হোক আমাদের সঙ্গে মেলামেশায় তেমন স্বচ্ছন্দ নন। ওঁরা দুজন একতলায় ওদের ঘরে চলে যেতে আমি আর স্বাগতা ওপরে উঠে এলাম। তারপরে আমি যখন বেরিয়ে এসেছি তখন স্বাগতার ঘর ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। আমি আর ওকে ডিসটার্ব করিনি, নিজের মতো বেরিয়ে এসেছি।

বাইরে এখন বেশ ঠান্ডা। ভাল করে সোয়েটার - মাফলার না জড়ালে ঠান্ডা লেগে যাবার সম্ভাবনা। গেস্টহাউসে ফিরে মনে হল একটু চা পেলে মন্দ হত না। একতলাতেই বিরাট ডাইনিং হল। ওখানে চা পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, চা না পেলে কফি হলেও চলবে।

ডাইনিং হলের কাউন্টার থেকে চা-এর কাপ নিয়ে ঘুরে তাকিয়ে দেখি কোণের একটা টেবিলে দেয়ালের গা-ঘেঁসে স্বাগতা বসে আছে। ওর সামনেও একটা চায়ের কাপ। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর সামনে বসলাম। স্বাগতার মুখটা কি একটু ভার ভার? তুমি কখন এলে? স্বাভাবিকভাবেই আমি প্রশ্ন করলাম। এইতো ... কিছুক্ষণ আগে। বেশ দায়সারা জবাব স্বাগতার। এবং তারপর হঠাৎই চুপ করে গেল স্বাগতা। আমি দু-তিনবার চায়ের কাপে চুমুক লাগালাম। তারপর অস্বস্তি কাটাতে জিজ্ঞাসা করলাম, এনিথিং রং উইথ ইউ?

স্বাগতা যেন আমার এই প্রশ্নটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। আপনি একা একা কোথায় গিয়েছিলেন? আমি গিয়ে দেখলাম আপনার ঘর বন্ধ।

এই তো ফোন করতে। সেইসঙ্গে চারদিকটা একটু ঘুরে এলাম। আমিওতো আপনার সঙ্গে যেতেপারতাম। আপনি একা চলে গেলেন। হ্যাঁ, পারতে। কিন্তু তোমার ঘর বন্ধ ছিল বলে আমি তোমাকে ডাকিনি, ভেবেছি তুমি বিশ্রাম নিচ্ছ। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। কেন ডাকলেন না?

স্বাগতার এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিই না। সত্যি বলতে, বেরোনোর আগে আমার মনে হয়েছিল, স্বাগতা সঙ্গে গেলে মন্দ হয় না, কিন্তু সদ্যপরিচিত এক যুবতীর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলে যদি সে বিরক্ত বোধ করে। এই সংশয় থেকেই আমি ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছি। কিন্তু এই কথাগুলো এমনভাবে স্বাগতাকে বলা যাবে না।

আমার থেকে জবাব না পেয়ে স্বাগতাও এবার চুপ করে যায়।

চা খাওয়া শেষ করে আমরা দুজনেই উঠে পড়ি এবার। প্রায় কোনো বাক্যবিনিময় না করে দোতলায় যে যার ঘরে ঢুকে যাই আমরা।

আকস্মিক এই ঘটনাটায় মনটা কেমন একটা ভার হয়ে ছিল। ঠিক কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না। স্বাগতার সঙ্গে মাত্র একদিনের পরিচয় — ওর সঙ্গটা ভাললাগে, মিশুকে পনার ভাবটাও অপছন্দ করার মতো কিছু নয়, কিন্তু আজকের সন্ধের এই অবাঞ্ছিত ঘটনাটাকে ঠিক কিছুর সঙ্গেই যেন মেলাতে পারা যায় না। টিভিতে একটা নিউজ চ্যানেল চালিয়ে সোফাটায় বসেছিলাম। মনের মধ্যেকার অস্বস্তিটা যেন কিছুতেই যেতে চাইছিল না। সন্ধে গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ, এখানে রাত আটটা থেকে রাতের খাবার পাওয়া যায়। খেতে যাব কিনা ভাবছি, দরজায় ছোট্ট করে টোকা পড়ল।

দরজা খুলেই দেখি সামনে স্বাগতা দাঁড়িয়ে। আমি চমকে উঠি।

এ কি স্বাগতা, তুমি?

আসতে পারি?

হ্যাঁ স্বচ্ছন্দে। ওই সোফাটায় বসো।

স্বাগতা ঘরে ঢুকে এসে সোফায় বসে। মুখটা নীচু। আমি কিছু বলার আগেই নিজে থেকে বলে, সরি, হীরকদা।

অনুমান করতে পারি এই অনুতাপের কারণটা, কিন্তু আমি আর পাল্টা কথা না বাড়িয়ে বলি, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

না, আপনি কিছু মনে করেননি তো। স্বাগতার অবুঝ জিজ্ঞাসা।

না, না। বললাম তো ঠিক আছে ..... ও নিয়ে তুমি আর ভেবো না .....

আসলে হীরকদা ভেবে .....

আর কিছু ভাবাভাবির নেই। আমি ওকে থামিয়ে দিই। চলো এবার আমরা রাতের খাওয়াটা সেরে আসি।

স্বাগতা আর কোনো কথা বলে না। বাধ্য মেয়ের মতো আমার সঙ্গে ডাইনিং হলে খেতে চলে আসে।

গতকাল সন্ধেবেলা দিল্লীর সরোজিনী নগর মার্কেটে যে ঘটনাটা ঘটল তা বেশ অপ্রত্যাশিতই ছিল। তবু কালকের ঘটনাটা কিছুটা মেনে নেওয়া গেলেও আজকের ওয়ার্কশপ চলাকালীন বা তার পরে যা ঘটল, তাকে আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সত্যিই কঠিন। ব্যাপারগুলো যেন সহজ স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এইবার। আমার মনে হচ্ছিল, এবার আমায় একটা কঠিন কথা বলতেই হবে স্বাগতাকে। ও আমার এমন কোনো আপনজন নয় যে ওর সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে আমার চলবে না!

প্রথম দিনের ঘটনাটার কথা মাথায় রেখে আমি পরের দুদিন সন্ধেবেলায় আমার বেরোনোর কথা স্বাগতাকে আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলাম, যাতে ওর ইচ্ছে থাকলে ও আমার সঙ্গে যেতে পারে। দুদিনই স্বাগতা আমার সঙ্গে বেরিয়েছিল। গতকালের আগের দিন আমরা গিয়েছিলাম স্থানীয় একটা পত্রিকার অফিসে। সঙ্গে ছিলেন প্রফেসর তিওয়ারী, উনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। উদ্যোগটা বলা যায় ওঁরই। গতকাল অবশ্য নিছকই মার্কেটিং এর উদ্দেশ্যে যাওয়া হল সরোজিনী নগর মার্কেটে।

দিল্লীতে আমি এর আগে বার তিনেক এসেছি। এটা চতুর্থবার। এবারে আলাদা করে কোনো মার্কেটিং করার প্ল্যান আমার আদৌ ছিল না। তবু সুছন্দা মিত্র আর প্রণবেশ পাঠক খুব করে অনুরোধ করলেন যাতে আমি ওদের সঙ্গে যাই। অনুরোধ রাখতেই হল শেষ পর্যন্ত। স্বাগতাকে বলতে ও রাজি হল।

সারা দিনের অনুষ্ঠান শেষ করে সন্ধের মুখোমুখি আমরা বেরোলাম। প্রতিটি দোকানে থিকথিক করছে ভিড়। আমার সেভাবে কিছু কেনাকাটা করার ইচ্ছা ছিল না, আর, তাছাড়া মন মেজাজটাও ঠিক ভাল লাগছিল না। বিকেল বেলায় বাড়িতে ফোন করে জানলাম গুবলুটার জ্বর হয়েছে, সঙ্গে কাশি। আমি বাড়ির বাইরে, রিনির ওপর চাপ পড়ছে। আর গুবলুও আমাকে নিশ্চয়ই মিস করছে এই সময়টায়।

আমরা চারজনে এ দোকান ও দোকান ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এখানে বেশিরভাগই ..... পোশাক-আষাকের দোকান। একটা দোকানে দাঁড়িয়ে সুছন্দাদি ওঁর কর্তার জন্য একটা পছন্দ করছিলেন, প্রণবেশদার সম্প্রতি একটি নাতনি হয়েছে, উনি নাতনির জন্য উলের ফ্রক আর টুপি বাছছেন। স্বাগতাও এটা-সেটা দেখছিল। বলল, বাবার জন্য একটা হাফস্লিভ সোয়েটার কিনবে। দোকানদারটি নানারকম সোয়েটার দেখাচ্ছিল।

দেখতে দেখতে একটা গাঢ় মেরুণ রঙের সোয়েটার আমার হাতে দিয়ে স্বাগতা বলল, দেখুন হীরকদা, এটা কেমন লাগছে? সোয়েটারটা সত্যিই খুব সুন্দর। মেরুণ রঙের ওপর ধবধবে সাদা দিয়ে চেককাটা ডিজাইন করা। বললাম, ভালই তো। আপনার পছন্দ? স্বাগতা জিজ্ঞেস করে।

আমার তো বেশ ভালই লাগছে, তবে তোমার বাবার পছন্দ হবে কিনা সেটা তুমি দ্যাখো। আমি বলি।

এটা বাবার জন্য নয় তো, আপনার জন্য।

আমার জন্য?

না, না, না, আমার জন্য তুমি সোয়েটার কিনছো কেন?

আমি বেশ অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়ে যাই। কেন? তাতে কী হল?

না, মানে ..... তুমি বাড়ির লোকের জন্য কেনো ..... আমার জন্য আবার কেন ..... অনেক সোয়েটার তো আছে আমার ..... স্বাগতা বলে, কিনলামই বা আরেকটা।

আমার অস্বস্তি বেড়ে যেতে থাকে। কী যে করব ঠিক করতে পারছি না। অথচ আমার অপ্রস্তুত অবস্থাটা উপে(া করে স্বাগতা তত(ণে দোকানীকে দাম দিতে যাচ্ছে। আমি বাধ্য হয়ে বলি, আমিও তোমাকে একটা কার্ডিগান কিনে দিই তাহলে ..... নাও পছন্দ করো।
স্বাগতা মাথা নাড়ে। অর্থাৎ এটা ওর পছন্দ নয়।
কেন? আমি বলি।
আমি কার্ডিগান ব্যবহার করি না। স্বাগতা জবাব দেয়।
বেশ, তাহলে অন্য কিছু কেনো ..... তোমার যা পছন্দ।
উঁহু।
এটা কেমন হচ্ছে স্বাগতা?
স্বাগতা আমার কথার .....
ওদিকে সুছন্দাদিদের কেনাকাটা শেষ, ওঁরা আমাদের জন্যই অপে(া করছেন। আমি মরিয়া হয়ে আরেকবার অনুরোধ করি স্বাগতাকে।
ও বলে না। আমি কিছু কিনব না।
মনটা তেতো হয়ে যায় পুরো ঘটনাটায়। ফেরার পথে সারা রাস্তা কেউ কোনো কথা বলি না আমরা।
গেস্টহাউসে ফিরে রাতের খাওয়া সেরে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে স্বাগতা বলে, আপনার আপত্তি থাকলে সোয়েটারটা আপনি নাও নিতে পারেন।
আমি বেশ নিস্পৃহভাবে বলি, তুমি তো কিছু নিলে না ..... আর কী বলব কী করে নিই বলুন।
কেন? আমি তো তোমায় কতবার রিকোয়েস্ট করলাম।
সে তো আমি আপনার জন্য একটা সোয়েটার কিনলাম বলে ..... নতুবা ..... স্বাগতা থেমে যায়।
আমি যেন একটা প্রচন্ড ঝাঁকুনি খাই। সদ্য গলাধঃকরন করা খাবারগুলো যেন পেটের মধ্যে দলা পাকিয়ে ওঠে। আমি কোনো কথা বলতে পারি না এরপর। প্রায় অভদ্রের মতো নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিই। মনে হয়, পরশুদিন নয়, আজ এখনই কলকাতার ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে যাই। না হলে সব উল্টোপাল্টে যাবে হয়তো। আর এক মুহুর্তও আমার ভাল লাগছে না এখানে।
জানি না, আজকের ঘটনাটা কালকেরটারই জের কি না। আজ ছিল আমাদের ওয়ার্কশপের শেষ দিন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আগে একটা বড়সড় বিতর্কসভার ব্যবস্থা ছিল আজ। নিয়মমতো প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকেই বিতর্কে মতামত দিতে হবে। বিষয়টাও বেশ নতুন — লাতিন আমেরিকার সাহিত্য বনাম ইউরোপিয়ান সাহিত্য। বেনারস হিন্দু ইউনির্ভাসিটির এক ত(ণ অধ্যাপকের পর স্বাগতার বলার পালা — ও দেখলাম, লাতিন আমেরিকার সাহিত্য নিয়ে বলতে গিয়ে ইউরোপিয়ান সাহিত্যকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। সে কী করে হয়? আমি মনে মনে ভাবলাম। এই মতের শরিক হওয়া আমার প(সম্ভব নয়। যাই হোক, আমার বলার পালা এলে আমি বলতে উঠলাম এবং আমার মতো করে এই মতের পাল্টা করেই বলতে আরম্ভ করলাম।
এটা নিছকই একটা অ্যাকাডেমিক আলোচনার বিষয়, সেখানে যে যার ভাবনা অনুযায়ী মত রাখতেই পারে। কিন্তু কী আশ্চর্য! আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার কিছু আগেই দেখলাম স্বাগতা হল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এটা কী রকম চির পরিচয়? ভীষণ রাগ হল আমার, ভীষণ ভীষণ রাগ। কিন্তু করার কিছু নেই, আমাকে অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত অপে(া করতেই হবে।
অন্যান্য দিন ওয়ার্কশপ শেষ হওয়ার পর সবাই একসাথে গেস্ট হাউসে ফিরে আসি। আজকে দেখলাম স্বাগতা আলাদা করে দুরত্ব রেখে চলছে। মাঝখানে একবার চায়ের বিরতিতে ওকে দেখেছিলাম বেনারসের ওই ত(ণ অধ্যাপকটির সঙ্গে কথা বলতে। ভাবলাম, ভালই হয়েছে। গতকালের ঘটনার পর থেকে স্বাগতাকে এড়িয়ে থাকতে পারলেই আমি যেন বাঁচি। কিন্তু অন্যদিকে, আজকের এই যে আচরণ, একটা বিতর্কসভার মতামতকে ব্যক্তি(গত স্তরে নিয়ে যাওয়া, এটা কি একজন কলেজের অধ্যাপকের শোভা পায়? নাকি এটা স্বাগতার কাছে আরও বেশি কিছু। ও হয়তো ভেবেছে ওর বিরোধিতা করার জন্যই বোধহয় আমি এমন কিছু বললাম। যা ভাবে ভাবুক গে। ত্র(মশ এই পুরো বিষয়টাই আমার কাছে বিরক্তি(কর হয়ে উঠছে। আজকের ঘটনায় তা যেন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাল।
ব্যাপারটা দেখল সকলেই। সুছন্দাদি তো আমায় বলেই ফেললেন আপনার সাথীটির আজ কি হল?
আমি কিছু জবাব দিলাম না। অল্প হেসে ম্যানেজ করলাম।
কার্যত এই প্রসঙ্গটাই আমার ভাল লাগছিল না। নিজের মতো গেস্ট হাউসে ঢুকে নিজের ঘরে ঢুকে গেলাম।
আজ বিকেলে কলকাতা ফেরার ট্রেনে চাপব। নিজের ঘরে বসে জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। এখন প্রায় দুটো বাজে, তিনটে নাগাদ এখান থেকে বেরোতে হবে। বাড়ি ফেরার জন্য একটা তাগিদ বোধ করছিলাম ভেতরে ভেতরে। গুবলুটার জ্বর ছাড়লেও সর্দিকাশি এখনও সারেনি। রিনির শরীরটাও ভাল নেই। মাঝে মাঝেই ওর তলপেটে একটা ব্যথা হয়, সেইটাই দুদিন ধরে বেশ বেড়েছে। ফিরে গিয়েই একটা ভাল ডাক্ত(ার দেখাতে হবে। বেরোনোর আগে একটু গড়িয়ে নেব বলে বিছানায় সবে শুয়েছি, দরজায় হঠাৎ টোকা পড়ল। ..... দরজার বাইরে থেকে প্যাকেটটা দেখিয়ে বলল, এটা কী করবেন?
ওটা কী?
আপনার জন্য কেনা সেই সোয়েটারটা।
আমি সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারি না। বোধহয় আমাকে চুপ থাকতে দেখেই স্বাগতা আবার প্র(ো করে, এখনও ডিসিশন নিতে পারেন নি?
আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গটা যে এভাবে হঠাৎ এসে পড়বে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। মন থেকে আসলে আপ্রাণ চেষ্টা করে মুছে ফেলতে চাইছিলাম দিল্লীর এই ক'টা দিনের স্মৃতিগুলো কিন্তু ভেতরের জমে থাকা রাগ আর অপমানটাও কাজ করছিল তলায় তলায়। একবার মনে হল, মুখের ওপর 'ওটা নেব না' বলে ইতি টেনে দিই বিষয়টার পর(ণেই মনে হল, তাতে আমার অপমানের জ্বালাটা কি জুড়াবে? আসলে গতকালের ঘটনাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। হয়তো স্বাগতার মনেও কিছু খারাপ - লাগা থাকতে পারে, যা অমি জানি না — অবশ্য জেনেই বা কী লাভ আমার! তার থেকে বরং এই দড়ি টানাটানির খেলাটা ঝুলেই থাক। আমি কিছু(ণের নীরবতা ভেঙে বলি, না। ওটা এখন তোমার কাছেই থাক। কলকাতা পৌঁছে দেখা যাবে।
পাল্টা কথা না বাড়িয়ে স্বাগতা ফিরে যায়।
৩.
শীতরাতের অন্ধকার ভেদ করে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে কলকাতাগামী রাজধানী এক্সপ্রেস। রাতের খাওয়া সেরে বেশিরভাগ যাত্রীই এখন গভীর ঘুমে। কোনো কোনো বার্থে বই পড়ার হাল্কা আলো জ্বলা দেখে মনে হয় কেউ কেউ হয়তো এখনও জেগে আছে। আমার ঘুম আসছিল না। এমনিতে ট্রেনের কামরায় আমার খুব একটা ভাল ঘুম হয় না তার ওপরে এখন মনের ওপর একটা বাড়তি বোঝাই তো। স্বাগতা সেন নামী এই কলেজ অধ্যাপকটির সঙ্গে আমার তো কোনো পরিচয়ের সূত্রই ছিল না কোনোদিন, অথচ এই পাঁচ - ছ দিনের আলাপ-পরিচয় ঘিরে এতটাই বিব্রত হয়ে থাকতে হবে আমায়, সে তো আমি কখনো বুঝিনি। নিজের প্রতিদিনের জীবনের চাকরি-রিনি-গুবলু-কলেজের খাতা দেখা-বাড়ি-চেনা আত্মীয়স্বজন এসবের মধ্যে দিয়েই তো ছ'দিন আগে কলকাতা ছেড়েছিলাম, আবার কয়েকঘন্টা পরেই ফিরে যাবো নিজের চেনা বৃত্তটার মধ্যে। মাঝখানের এই কটা দিন একটু অন্যরকমভাবে কাটবে — অ্যাকাডেমিক চর্চা, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা, কথা-গল্পে মনের খোরাক তৈরী হবে বলেই এই ধরণের অনুষ্ঠানগুলোয় আসতে চাই আমি, কিন্তু মনের সেই নিশ্চিন্ত উপভোগ নিয়ে বাড়ি ফিরতে

পারছি কই?

সম্পূর্ণ আলাদা একটা টানাপোড়েন স্বাগতা নিয়ে — মনটা যেভাবে বিপ্তি হয়ে আছে বোধহয় নিজের পরিচিত আবহাওয়ায় না ফেরা পর্যন্ত তার উপশম হওয়ার নয়। স্বাগতাকে আমার ভাললাগা ও পছন্দ করার মধ্যে কি কোনও দোষ ছিল? নিজেকেই প্রশ্ন করি আমি। ছ'দিন আগে ট্রেনের মধ্যে আলাপ, একই পেশার দুজন মানুষের মধ্যে এইটুকু মত বিনিময় তো হতেই পারে, তার বেশি তো কিছুই নয়! কিন্তু .....

ভাবনার সূত্রগুলো ছিঁড়ে ফেলে উঠে বসি বার্থে। মাথার কাছে রাখা বোতল থেকে জল খাই। যাওয়ার সময় যেমন, এবার ফেরার সময়েও আমার আর স্বাগতার একই কোচ। এই কামরাতেই তিনটে সারি পরে স্বাগতার বার্থ। ওর অবশ্য এবারেও ইচ্ছে ছিল কারোর সঙ্গে সিট বদল করে আমার নিচের বার্থে চলে আসা। কিন্তু এবারে তা সম্ভব হল না কারণ এখানে বেশিরভাগ যাত্রীই পরিবার নিয়ে উঠেছেন, তাদের মধ্যে থেকে একজনকে সরতে বলা যায় না। আর কেন জানি না এবারে আমিও চাইছিলাম না স্বাগতা আমার কাছে বা পাশে থাকুক। যদিও ট্রেন ছাড়ার পর থেকে বেশ কিছুক্ষণ স্বাগতা আমার এখানেই বসেছিল, এমনকী রাতের খাওয়া আমরা একই সঙ্গে বসে খেয়েছি। কিন্তু সেটা মূলত ওর আগ্রহে। আর ওর সঙ্গে আমায় নিতান্ত যা দুএকটা কথাবার্তা বলতে হয়েছে তা নিতান্তই মামুলি। যদিও লক্ষ্য করেছি ও মাঝে মাঝেই একটু বেশী আন্তরিক হতে চেয়েছে আবার। গতকাল বিকেলের ঘটনার পর থেকে এই প্রথম দেখছি ওর মধ্যে ফিরে আসতে চাইছে সেই পুরনো প্রগলভটা। তবে সচেতনভাবেই তাতে তেতো প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ নেই। আমিও অবশ্য এবার খুব সতর্ক।

এই যেমন খাবার দেওয়ার একটু আগেই স্বাগতা নিজে থেকেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলল, জে. এন. ইউ. এর ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ম্যাগাজিনটা দেখলেন?

হ্যাঁ।

খুব রিচ, তাই না। আমাদের কলেজে এরকম ম্যাগাজিন ..... ভাবাই যায় না।

এদের রিসোর্স অনেক বেশি। আমাদের ওয়েস্টবেঙ্গলের সঙ্গে তুলনা করে কী লাভ।

আসলে এখানে এলে বোঝা যায়, আমরা কতটা পিছিয়ে আছি।

কথা শেষ হয়ে যায়, কারণ আমি প্রসঙ্গটার ইতি টেনে দিয়েছি। আসলে পাল্টা আন্তরিকতার দরজা-জানালা খুলতে আমি আর রাজি নই। ট্রেনের এই কয়েকটা ঘন্টা আমায় কোনোভাবে কাটিয়ে দিতে হবে।

রাতের খাবার খেতে খেতেও স্বাগতা কথা বলতে আরম্ভ করেছিল। রাজধানীর খাবারের কোয়ালিটি ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে, তাই না? হ্যাঁ। আগের থেকে খারাপ। আমি বলি।

এর আগে খাবারের আগে একটা খুব ভাল স্যুপ দিত, এখন সব বন্ধ করে দিয়েছে দেখছি।

কী আর করা যাবে। যা দিচ্ছে তাই আপাতত খেয়ে নাও। আমি থেমে যাই।

এয়ার কন্ডিশন কোচে হালকা ঠান্ডার আরাম থাকলেও ঘুম না এলে খুব দমবন্ধ লাগে। জল খেয়ে আমি বার্থ ছেড়ে নেমে কামরার বন্ধ এলাকার বাইরে দরজা আর টয়লেটের মাঝের করিডরটার দিকে এগিয়ে যাই। স্বাগতার বার্থটা নীচে। ওর বার্থের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়ে গলা অবদি কম্বল চাপা দিয়ে ও ঘুমোচ্ছে — ঘুমিয়ে থাকা স্বাগতার মুখে পুরনো সৌন্দর্যের আভা। কয়েক সেকেন্ড থমকে দাঁড়াই আমি, আবার এগিয়ে যাই দরজার দিকে।

দুদিকে দুই দরজা আর টয়লেট, মাঝখানের এই অল্প জায়গাটায় দাঁড়ালে ট্রেনের প্রচন্ড গতি টের পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে খুব দ্রুত হয়ে চলা ঘটাং ঘট ঘটাং ঘট আওয়াজ — রেলের লাইনের সঙ্গে চাকার নিরন্তর দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

নিয়মমতো এখানে একজন কোচ অ্যাটেন্ডেন্টের থাকার কথা, যদিও আপাতত কেউই এখানে নেই। এ. সি. মেশিনের তলাবন্ধপাল্লাটায় হেলান দিয়ে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। একটানা ঘটাং ঘটাং আওয়াজ, মাঝে মাঝে বেশ প্রবল ঝাঁকুনি — কোনো কিছুতে ভর দিয়ে না থাকলে টাল সামলানো শক্ত। ভেতরের দমবন্ধ এসি -র থেকে এই দুলুনি আর ঝাঁকুনি আমার কাছে বেশ লাগে, একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। ট্রেন চলতে থাকে।

ঠিক কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ ক্যাঁচ করে একটা আওয়াজ পেয়ে পাশে তাকাই। এসি কামরার কাঁচের দরজা ঠেলে কেউ বাইরে বেরোচ্ছে। পুরো দরজাটা ফাঁক হতে আমি চমকে উঠি। দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসছে স্বাগতা।

ধীর পায়ে স্বাগতা এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। রাতের অন্ধকার চিরে তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছে রাজধানী এক্সপ্রেস। ঘটাং ঘট। ঘটাং ঘট। দুই কামরার মাঝে জুড়ে থাকা লোহার পাতদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে প্রবল সংঘর্ষে।

আমিও কেঁপে উঠি ভেতরে ভেতরে।

অস্ফুটে বলি, স্বাগতা। তুমি?

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে স্বাগতা। আমার কথা যেন ওর কানেই যায়নি।

আমি আবার বলি, কী ব্যাপার স্বাগতা?

ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়। সরি, হীরকদা .....

ওর দুচোখের নিচে থমকে থাকা জলের বাঁধ আমার নজর এড়ায় না। এমন কোনো মুহূর্তের জন্য ঠিক আমি প্রস্তুত ছিলাম না। টালমাটাল গতির সামনে এ যেন এক স্থির হয়ে যাওয়া দৃশ্য।

আমি খুব সাবধানেই বলি, ঠিক আছে। থ্যাঙ্কস।

কিন্তু ..... স্বাগতা আরও কিছু যেন বলতে চায়। ঠিক তখনই ট্রেনটার এক প্রবল ঝাঁকুনি — ঘটাং ঘট ..... ঘটাং ঘট ..... লাইন পরিবর্তন করছে বোধহয়। টাল সামলাতে না পেরে স্বাগতা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমার ওপর।

টের পাই চোখের নোনা জলে আমার বুকের কাছের সোয়েটারটা ভিজে যাচ্ছে।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে, ট্যাক্সি নিয়ে আমি এখন বাড়ির পথে। স্বাগতাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছি আগেই। ও এতক্ষণে অনেকটা পথ এগিয়ে গেল বোধহয়। অবশ্য দুজনের গন্তব্য আলাদা। স্বাগতা যাবে টালিগঞ্জ আর আমি দমদম। মেট্রো রেলের দুই প্রান্তিক স্টেশন, মাটির অতল গভীর দিয়ে দুই প্রান্তের গোপন যোগাযোগ, ওপরের রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে টেরই পাওয়া যায় না।

বেলা তখন এগারোটা। রাস্তায় লোকজন, গাড়ির ভিড়। আমার সিটের পাশে আমার বড় সুটকেশ আর তার পাশে একটা বাদামী রঙের প্যাকেট। ওর মধ্যে সেই মেরুণ রঙের সোয়েটার, প্যাকেটটা আর স্যুটকেশে ভরা হয়ে ওঠেনি। তার পাশে একটা জলের বোতল। শ্যামবাজার পেরিয়ে ট্যাক্সিটা এবার দমদমের দিকে ঢুকছে, আর বড়জোর মিনিটপনেরর পথ। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। খুব খিদে পাচ্ছে আমার। জলের বোতল থেকে কিছুটা জল খেয়ে নিলাম আমি।

বাড়িতে ঢুকতেই হৈ হৈ করে উঠল গুবলু। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা, আমার আর জ্বর আসেনি, মনে হচ্ছে সেরে গেছি। আমি ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলি, ভেরি গুড।

রিনি এগিয়ে এসে বলল, চা খাবে তো?

আগে কিছু খাব, বড্ড খিদে পেয়েছে।

ঠিক আছে। তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও। আমি জলখাবার রেডি করছি।

জুতো খুলে, জামাকাপড় তোয়ালে নিয়ে বাথরুম ঢুকেপড়ি আমি। আর বেসিনের সামনের আয়নায় নিজের মুখটা দেখেই ঝট করে মনে পড়ে যায় কথাটা। আবার একটা ধাক্কা লাগে বুকের মধ্যে,পরক্ষনেই থেমে যায়। ট্যাক্সি থেকে নামার সময় স্যুটকেশটা নামালেও সোয়েটারের প্যাকেটটা রয়ে গেছে ট্যাক্সির মধ্যে। শেষ মুহুর্ত্তে একদম ভূলে গেছি ওটার কথা ..... ইস্ .....।